এই দিনটাতে কতকিছু মনে হয়

কবিতা পারভেজ

আমার বাবা (এম আর আখতার মুকুল) এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু'র আলাপ সেই ৫০ এর দশকের প্রথম দিকে , ছোট ভাই এর মত স্নেহ করতেন বঙ্গবন্ধু, ডাকতেন 'মোকলা' বলে। মুক্তিযুদ্ধের আগে বঙ্গবন্ধু' বা তার পরিবারের কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে বাবা'র কাছ থেকে শুনেছি ১৯৬৫/৬৬ সালের দিকে আমার মেজোমামা (ডাঃ মোশারফ হোসেন খান) এর সঙ্গে যে পাত্রি'র বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো এম ই খান সাহেবে'র বড় মেয়ে (মেহের খান) । সেই খান সাহেবে'র বাড়ীটি ছিলো ঠিক ধানমন্ডি ৩২ নং বঙ্গবন্ধু'র পাশের বাড়ী। সেই সময় আমার বাবা এই মেয়ে'র খোঁজ নিতে রেনু চাচী অথার্ৎ (মিসেস মুজিব) এর শরনাপন্ন হয়েছিলেন। রেনু চাচী মেহের মামী'র অনেক প্রশংসা করেছিলেন তাই আমার মামা'র বিয়েটা অনেক ধুমধামে'র সঙ্গেই হয়েছিলো । পরে মেজোমামা ইংল্যান্ডে ডাক্তার হিসেবে চাকুরী করে সেখানেই সেটেল্ড হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে'র সময় যখন কলকাতায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' এর কার্যক্রম শুরু হয় তখন আমার বাবা কে 'ডি জি ইনফরমেশন' এর দায়িত্ব দেওয়া ছাড়াও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে কোন অনুষ্ঠান করতে বলা হোল। বাবা 'চরমপত্র' নাম দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করলেন। রাত ২টা থেকে বি বি সি, ভয়েস অফ আমেরিকা ইত্যাদি শুনে তারপর লিখতেন বেলা ৮টা পর্য্ন্ত। তারপর সেই লেখা নিয়ে ৫৫ বালিগঞ্জ প্লেস সেই বাড়িতে গিয়ে সেটা একটা সাধারন ঘরে রেকর্ড্ হতো। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিলো এই 'চরমপত্র'। একেক দিন 'চরমপত্র' লেখা ও পাঠ করবার জন্য বাবা সাড়ে সাত রুপি পেতেন। আমরা তখন কলকাতায় কত কষ্টের মধ্যে ছিলাম কিন্তু আমার বাবা মাকে কোনোদিন মনোবল হারাতে দেখিনি। দেখেছি মাকে হাসি মুখে একই শাড়ি পরে দিন কাটিয়েছেন। সংসার আর চলছিলোনা তাই মা 'স্বাধীন বাংলা বেতার'এর অনুষ্ঠান 'মুক্তিযোদ্ধা'র মায়ের চিঠি' ছাড়াও 'আকাশবাণী'তে 'জ্বালামূখি রোশেনারা' নামে এ্কটি অনুষ্ঠান করতেন। এর মধ্যেও আমার মা'র ইচ্ছা ছিলো আমাকে কবিগুরু'র আশ্রম শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠানো কিন্তু নিজেদের যেখানে খাবার পয়সা নেই সেখানে সেই স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের শেষে আমরা দেশে ফিরলাম তখন আমার মা'র সেই বাসনা পূরণ করবার জন্য 'বাংলা একাডেমি'তে চাকরী নিলেন।

দশ জানুয়ারী '৭২ বঙ্গবন্ধু' দেশে ফিরে এলেন। আমার বাবাকে 'বাংলাদেশ বেতার' এর মহাপরিচালক করা হলো। বঙ্গবন্ধু যখনই কোন অনুষ্ঠান, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেতেন আমার বাবাকেও যেতে হতো কারণ সেইটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়তো। আমার বাবা আমাকে সব জায়গাতেই নিয়ে যেতেন আমিও খুব খুশি হয়ে বাবার সঙ্গে যেতাম। আমার তখন বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছে থেকে দেখবার ও তার সাহচর্য্ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেই মানুষটি সাহায্য না পেলে জানিনা আমাদের কি হতো সেই ইন্দিরা গান্ধী যখন ঢাকায় (ফেব্রয়ারী ৭২) এলেন আমার বাবা'র ওপর সব দায়িত্ব পড়েছিলো কোথায় তার অনুষ্ঠান হবে, 'ইন্দিরা ম্ঞ্চ' তৈরী করবার আইডিয়া টা ছিলো বাবারই। কোথায় কি হবে সব বাবাই অর্গানাইজ করেছিলেন। তখন প্রথম মিসেস গান্ধীকেও খুব কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হলো।

এর আরও কিছুদিন পরে 'গনভবন' এ 'স্বাধীন বাংলা বেতার' কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান গুলো, 'জ্ল্লাদের দরবার' নাটক সব কিছু নিয়ে এ্কটি পুরো অনুষ্ঠান নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হলো। সেইদিন আমাদের দুবোনকে বঙ্গবন্ধু কোলে বসিয়ে অনুষ্ঠান দেখলেন। যখন বাবা 'চরমপত্র' পড়ে শোনালেন বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে বাবাকে বললেন,'মোকলা' এইটা তুই কি করছোস? এইজন্যইতো বাংলাদেশে'র মানুষ তোকে এত ভালোবাসে'।

১৯৭২ সালে আমার পূরোনো স্কুল 'আজিমপুর গার্লস স্কুলে' ভর্তি হলাম। ১৯৭২ এ প্রথম 'বিজয় দিবস' এ বঙ্গবন্ধু সাভারে 'জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বাবা'র সঙ্গে আমিও ছিলাম সেই ইতিহাস এর সাক্ষী। এইভাবেই কেটে গেলো '৭২।

১৯৭৩ এর ফেব্রয়ারী মাসে মা আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন শুনেই আমার ছোট বোন সঙ্গীতাও কান্নাকাটি । সেও যাবে আমার সঙ্গে, মা তো কিছুতেই রাজি না কিন্তু বোন এর কান্না দেখে অবশেষে মা রাজি হলেন। আমরা কলকাতা হয়ে সেই ভোরবেলা'র ট্রেন ধরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পূর্বপল্লী'র গেষ্ট হাউজে উঠলাম। দ্বিতীয় দিনই আলাপ হলো আমার সহপাঠি মৈত্রেয়ী আর নন্দিতা'র সঙ্গে, মৈত্রেয়ী'র মা এসেছিলেন ওর জন্মদিন উপলক্ষে। ৯ ফেব্রুয়ারী তাই ওর জন্মদিনটা আজও মনে আছে। যাইহোক আমরা দুইবোন 'পাঠভবন' এ ভর্তি হয়ে গেলাম থাকার ব্যাবস্থা 'শ্রীসদন হোস্টেল'। তখনও পযর্ন্ত ধারনাই করতে পারিনি যে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচ বছর কাটবে এমন সুন্দর একটি পরিবেশে যেখানে কেউ না গেলে তাকে বোঝানো অসম্ভব সেই অনুভূতি ক্যামন?

আস্তে আস্তে স্কুল, সংস্কৃতি, খাওয়া দাওয়া ও পরিবেশ এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফেললাম। আমি যেই মেয়ে মাংস, ডিম আর ডাল ছাড়া কিছু দিয়ে ভাত খেতাম না, সবজি আর মাছ খাওয়া শিখে তা ভালোবেসেও ফেললাম। আমার বোন যে এত সুন্দর নাচতে পারে তা আমাদের ধারণাই ছিলোনা। আমি নিজেও রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালোই গাইতে শিখে গেলাম। ওখানে অষ্টম শ্রেণী পযর্ন্ত গান, নাচ, ছবি আঁকা, হাতের কাজ এবং প্রত্যেকদিন খেলার মাঠে বিভিন্ন ধরনের খেলা কমপালসরী ছিলো। ৭৩,৭৪ সাল পড়াশোনা আর বিভিন্ন উৎসবের (বসন্ত উৎসব, পহেলা বৈশাখ, বর্ষা্ মঙ্গল, শারদ উৎসব, পৌষ উৎসব ও সমাবর্তন একসঙ্গে পালিত হোতো) দিনগুলো কেটে গেলো। আমাদের দুবোন এর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সময়ের জন্য আমার মা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এদিকে আমার বাবা'র নতুন পোষ্টিং হোলো, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস কাউন্সিলর হিসাবে। বাবা আমাদের দুবোনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। যদিও আমাদের ইচ্ছে ছিলো না তবুও বাবা'র সঙ্গে লন্ডনে যাবার লোভও সামলাতে পারলামনা। লন্ডনে যাবার আগের দিন বাবা আমাদের দুবোনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে দ্যাখা করতে গেলেন। এই প্রথম আমি ৩২ নাম্বারে গেলাম, দুপুরবেলা বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে বসে সবাই ভাত খাচ্ছিলেন। আমার ধারনা একটা দেশে'র রাষ্ট্রপ্রধানের বাড়িতে মনে হয় প্রত্যেক বেলায় পোলাও কোর্মা্ ইত্যাদি খায়। রেনুচাচী বাবাকে ভাত খেতে বললেন, আমার উৎসুক চোখ টেবিলে গেলো, দেখি দু তিন রকমের ভর্তা্ সবজি আর বাতাশা মাছ দিয়ে শিম এর চচ্চরি, বঙ্গবন্ধু খুব মজা করে ভাত মাখাচ্ছিলেন। চোখের ইশারায় আমাকে খেতে বললেন। আমি বললাম, না চাচা আমরা খেয়ে এসেছি। খাওয়া শেষে চাচীকে বললেন 'রেনু তোমার রান্না আইজ খুব মজা হইছে'। সত্যি এই মহামানব কত অল্পেতেই খুশি হতেন ভাবলেই অবাক লাগে। অথচ ১৯৭৮ যখন দেশে ফিরলাম তখন বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া ছিলো মহাপাপ, আর বঙ্গবন্ধু নাকি কোটি কোটি টাকা মেরে বাংলাদেশকে ফকির বানিয়ে দিয়েছেন? আর বাংলাদেশের মানুষ তা বিশ্বাস করেছে?? যাইহোক সেদিন খাওয়া দাওয়া শেষে আমাদের দুবোনকে কোলে বসিয়ে শান্তিনিকেতনের গল্পো শুনলেন। ভেবেছিলাম ফান্টা, প্যাটিস আর পেইষ্ট্রি খাবো ৩২ নাম্বারে তার বদলে চানাচুর দিয়ে মুড়িমাখা যেই ভালোবাসা'র ডোরে খেয়ে এসেছিলাম তখনতো বুঝিনি কয়জনের এ রকম সৌভাগ্য হয়? চলে আসবার সময় বঙ্গবন্ধু ও রেনুচাচী'র পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম চাচা মাথায় চুমু দিলেন। সত্যিই উনার মত একজন মানুষের আর্শী্বাদ নিয়েই জীবনের পথ চলছি। ভাগ্গিস আমার বাবা'র সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এত মধুর সর্ম্পক ছিলো!

৭৫ এর আগষ্ট মাসে লন্ডনে আমাদের দুবোন এর কান্নাকাটি কারণ আমাদের ওখানে মোটেই ভালো লাগছিলোনা। লেখাপড়াতেও সুবিধা করতে পারছিলাম না। ঐ মাসেই আবার মা আমাদের নিয়ে দেশে এসে আবার শান্তিনিকেতনে দিয়ে আসতে গেলেন, আমাদের কে পৌছে দিয়ে কলকাতা থেকে আবার ঢাকাতে ফেরার কথা। ঠিক সেদিন ভোর বেলা খবর এলো বঙ্গবন্ধুর মত মহামানবকে তার পরিবারসহ হত্যা করা হয়েছে? বাংলাদেশ ও আমার বাবা সহ আমাদের জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেলো। বাবা'র চাকরি চলে গেলো, ভাইয়া'র চাকরির টাকায় লন্ডনের সংসার আবার আমাদের দুবোনের স্কুলের

খরচ! বাবা দিশেহারা হয়ে গেলেন। সেই বছরের শেষে বাবা দিল্লীতে এলেন এই ভেবে যে হয়তো দেশে ফিরতে পারবেন। কিন্তু ভারত সরকার আমার বাবাকে বললো যে বাবার জন্য দেশে ফেরা খুবই রিস্কি এমনকি বাবা'র পশ্চিমবঙ্গেও যাওয়া উচিৎ হবেনা। ওখানেও বাবাকে মেরে ফেলতে পারে বাংলাদেশ থেকে লোক পাঠিয়ে। তাই বাবার অনেক ইচ্ছা সত্বেও শান্তিনিতেনে আসতে পারলেন না। তখন ভাইয়াকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের কে আনতে। আমাদের দুবোনকে প্রায় মাস খানেক এর ছুটি দিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল সুপ্রিয় ঠাকুর। আমরা খুব খুশি বাবা ও মা এর সঙ্গেও দেখা হবে আর এই সুযোগে দিল্লী দেখা হবে! ভারত সরকার আমার বাবাকে 'গ্রেটার কৈলাশে' একটি বাড়ীর ব্যাবস্থা করেদিলো । দিল্লী পৌছে দেখি আমার বাবা, মা আর ভাইয়া সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাস্তা করে বাস ধরে খান মার্কেটের কাছে একটি সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার ছিলো সেখানে চলে যায় । সেখানে পৌছে অনেক সিকিউরিটি পেরিয়ে এক ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুললেন শেখ রেহানা। খুব অবাক হয়ে গেলাম। এর মধ্যেই ছোট্ট জয় আর পুতুল নানু আর নেনু বলতে বলতে আমার বাবা আর মাকে জড়িয়ে কোলে উঠে গেলো। নানু তো আমার বাবাকে বলতো কিন্তু 'নেনু' শব্দটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু যে চাচীকে 'রেনু' ডাকতেন জয় আর পুতুল রেনু আর নানী ডাকার বদলে 'নেনু' ডাকতো। ওরা তো জানতোনা যে ওদের জীবন থেকে নানা নানী'র আদর ভালোবাসা উঠে গিয়েছে সেই খুনীদের দোসর মুশতাক, ডালিম, জিয়ার জন্য।

প্রত্যেকদিন এই ছিলো আমদের রুটিন সকালে হাসিনা আপা'র বাসায় যাওয়া সারাদিন ওখানে থেকে রাতে খাওয়া দাওয়া করে আবার বাসায় ফিরে আসা। তখন দেখেছি হাসিনা আপাকে খুব কাছে থেকে লম্বা লম্বা চুল কি সুন্দর দেখতে তার ওপর রান্নাবান্না, সেলাই, উল দিয়ে সোয়েটার বোনা। কি পারতেন না? একদিন আমার ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো 'আপা চাইনিজ রান্না পারেন? পরের দিন গিয়ে দেখি বেশ কয়েক পদ এর চাইনিজ দুপুরে রেডি। দুই বাচ্চা নিয়ে এতকিছু কি ভাবে পারতেন? এখন যখন দেখি ১৬ কোটি মানুষের দেশ সামলাচ্ছেন। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে দুইবোন জীবনযুদ্ধ ভালই করছেন। তখনকার আপা'র সঙ্গে এখনকার আপার সঙ্গে অনেক মিল। দুইবোন টাকা পয়সার লোভ করেননি কারণ তাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে তারা কোন বাবা মা'র সন্তান।

এর মধ্যে দিল্লীতে 'শোলে' সিনেমাটা রিলিজ হোলো সিনেমাটার গল্পটা আমাদের জানা ছিলোনা শুধু শুনেছি ভালো সিনেমা। আমরা দেখতে যাচ্ছি শুনে রেহানা আপা যেতে চাইলেন। আমার বাবা বললেন 'ও যখন যেতে চাচ্ছে যাক, গেলে হয়তো মনটা ভালো লাগবে'। ভাইয়া টিকিট জোগাড় করলো। যেদিন দেখতে গিয়েছি রেহানা আপা সঙ্গে আছে দেখে ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি'র লোকও ছিলো। সেই লোক দুটো পিছনের সীট এ বসেছে। সিনেমা চলছে যেই ঠাকুর এর পরিবারের সবাইকে গব্বার সিং মেরে সেই ছোট্ট ছেলেটি মারতে গিয়েছে রেহানা আপার চিৎকারে আমরা বোকা হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আপাকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। খুবই খারাপ লাগলো যে সিনেমা গল্প না জেনে ক্যানো আপাকে নিয়েছিলাম? ঐ দৃশ্য আপাকে রাসেলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

এর মধ্যে আমার মা বললেন 'চলো একদিন আগ্রায় ঘুরে আসি,তাজমহল এর এত কাছে এসেও না গেলে আফসোস থেকে যাবে'। একদিন এর ট্যুরের বাসের টিকিট কেনা হোলো কারণ আপারা যদি জানতে পারে মন খারাপ করবে। ফতেপূর সিক্রি, আগ্রা, বৃন্দাবন আর মথুরা খুব ভালো লেগেছিলো সেই ট্যুর কিন্তু পরেরদিন যখন আপা'র ওখানে গেলাম দুইবোন আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ। পরে আমার মা বললেন 'দোষ আমার তাজমহল এর টানে চলে গিয়েছি'। কিছুক্ষন পর দুইজন শান্ত হলেন।

দিল্লীতে ৪/৫ মাস আমার বাবা মা আর ভাইয়া আপাদের যে বিপদের সময় প্রত্যেকদিন গিয়ে তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাড়িয়েছিলেন । আবার উনারা যখন লন্ডনে তখনও আব্বা চেষ্টা করেছেন তাদের পাশে দাড়াতে। আবার আমার বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন উনারা দুবোন তখন আমাদের পাশে দাড়িয়েছিলেন।

সেই বিপদের দিনের কথা দুবোনের কেউই ভোলেননি তাইতো ১৪ বছর পর এবার সিডনিতে উইমেন ইন লিডারশিপ প্রাইজ নিতে যখন এসেছিলেন তখন খবর পাঠালেন আমি যেন যাই উনাদের সঙ্গে দেখা করতে। হাসিনা আপার সাথে শেষ দেখা হয়েছিলো আমার বাবা যেদিন মারা গেলেন ২০০৪এর ২৬শে জুন। জড়িয়ে ধরে অনেক শান্তনা দিয়েছিলেন। আবার দেখা ২৯শে এপ্রিল রবিবার ২০১৮তে। সকাল ১০টায় আমি আর পারভেজ দুই বোন এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর হোটেলে। ঢুকেই দেখি হাসিনা আপাও নীল শাড়ি পরেছেন আমিও একটা নীল শাড়ী পরে গিয়েছিলাম আপা হেসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল আছে নইলে দুজনই নীল শাড়ী কি করে পরলাম? আপাদের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক ছিলাম সেই দিল্লীর কথা, শোলে' সিনেমা'র কথা সব মনে করে আমরা গল্প করলাম। আপা বললেন, মুকুল ভাই আমাদের দুবোনকে অনেক স্নেহ করতেন, এবং আওয়ামী লীগ এর সমর্থনে সব সময় লেখালেখি করতেন। মুকুল ভাইও নেই সেই লেখাও নেই।

আমার বাবা চলে গিয়েছেন আজ ২৬শে জুন ঠিক ১৪বছর আগে এই দিনে। কিন্তু তার স্নেহ মায়া মমতা স্মৃতি আজও কত মানুষের মন ছুয়ে আছে। বাবা মা'র ভালো কাজের জন্য ছেলেমেয়েরাও কোনো ভাবে সন্মানিত হয়, উপকৃত হয়। সত্যিই বাবা আপনার মেয়ে হয়ে পৃথিবী'র মূখ দেখেছিলাম আমার জীবন ধন্য। আল্লাহ আমার বাবা মাকে বেহেস্ত নসীব কোরো।